দ্য সিক্রেট ওয়ার ইন
আফগানিস্তান

মূল

স্টিভ কোল

রূপান্তর

মাহজাবিন খান

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

দ্য সিক্রেট ওয়ার ইন
আফগানিস্তান

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

The Secret War in Afganistan by Steve Cole
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95878-0-4

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৫

প্রথম অধ্যায় : Blind into Battle

'খালিদের কিছু একটা হয়েছে' ১১
বিচারের দিন.....২২
বন্ধুর মতো বন্ধু.....৩৬
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট.....৫৩
সর্বনাশা সাফল্য.....৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : হারানো শান্তি

ছোট্ট পরিবর্তন.....৮৩
কারজাইয়ের জন্য তালেবান ৯৮
প্রহেলিকা.....১০৫
তার শাসন আমাদের শাসনের চেয়ে ভিন্ন ১১২
মিস্টার বিগ.....১২৪
রাষ্ট্রদূত বনাম রাষ্ট্রদূত ১৩৪
সমুদ্রে ছিদ্র.....১৪৪
উগ্রবাদী.....১৫৭

তৃতীয় অধ্যায় : উত্তম পরিকল্পনা

সুইসাইড ডিটেকটিভস ১৬৭
প্ল্যান আফগানিস্তান ১৭৬
খুন ও ছায়া সরকার.....১৮৪
হার্ড ডাটা.....১৯৩

কঠোর ভালোবাসা.....২০২
আতংক ও ছায়া সরকার.....২১২
দ্য নিউ বিগ ডগস.....২২৪
কারজাই উচ্ছেদ.....২৩৮
মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য যুদ্ধ.....২৪৮

চতুর্থ অধ্যায় : ভ্রান্তি নিরসন

ওয়ান ম্যান সি.আই.এ.....২৬০
কনফ্লিক্ট রেজ্যুলিউশন সেল.....২৭৫
কায়ানি ২.০.....২৮৫
জীবন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ.....২৯৪
কায়ানি ৩.০.....৩১২
জিম্মি.....৩২৪
ড্রাগনস ব্রেথ.....৩৩২
শহিদ দিবস.....৩৪২
ফাইট এন্ড টক.....৩৫৫
আফগান হাত.....৩৭০
হোমিসাইড ডিভিশন.....৩৮২
সেলফ ইনফ্লিক্টেড ওন্ড.....৩৮৯
ক্যু.....৩৯৮
উপসংহার : ভিক্টিম ইম্প্যাক্ট স্টেটমেন্টস.....৪১৪

ভূমিকা

ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার সাউথ এশিয়ান করেসপনডেন্ট হিসেবে দিল্লিতে আসি ১৯৮৯ সালে। বয়স ছিল ৩০-এর কোঠায়। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার খবরাখবর সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করছিলাম। ঘুরে বেড়িয়েছি রাজধানী থেকে রাজধানী, দেখেছি গেরিলা যুদ্ধ, সামরিক ক্যু এবং সাক্ষী হয়েছি বিপ্লব থেকে বিপ্লবের।

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীর শেষ ইউনিটটিও বিদায় নিয়েছে তখন। সোভিয়েত আক্রমণ কেড়ে নিয়েছিল আফগানিস্তানে এক থেকে দুই মিলিয়ন মানুষের মূল্যবান জীবন। বলা যায়, আফগানিস্তানের যুদ্ধপূর্ব জনসংখ্যার দশ শতাংশের বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ল্যান্ডমাইন এবং বোম্বিংয়ের কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে হাজার হাজার লোক। পাঁচ লাখের মতো আফগান পরিণত হয় রিফিউজিতে। সোভিয়েত ও আফগান কমিউনিস্টরা মিলে হত্যা করেছে শিক্ষিত আফগান এলিট এবং ট্রাডিশনাল রাজনীতিবিদদের। কাবুলে মুহাম্মদ নজিবুল্লাহর শাসনামলকে মদদ দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন রেখে যায় হাজারো কে.জি.বি অফিসার ও সামরিক উপদেষ্টা।

কে.জি.বি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সিক্রেট পুলিশ ফোর্স। একজন ফিজিশিয়ান থেকে সিক্রেট পুলিশের প্রধান হয়েছিলেন এই নজিবুল্লাহ। আফগানিস্তানের রাজধানীসহ আরও কয়েকটি শহর নিয়ন্ত্রণ করত নজিবুল্লাহর বাহিনী।

গ্রাম্য এলাকাগুলো ছিল মুজাহিদিনদের দখলে। এই অ্যান্টি-কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ফান্ড ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করত সি.আই.এ। এই সহায়তার ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের গোয়েন্দারাও পিছিয়ে ছিল না।

যুদ্ধের পর মারাত্মক অচলাবস্থা দেখা দিল। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের পর পত্রপত্রিকার প্রথম পাতা থেকে আফগানিস্তানের নাম মুছে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরের শিরোনামেও আফগানিস্তানকে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু ওয়াশিংটন পোস্টের জন্য আফগানিস্তান তখনো ছিল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এই জন্যে নয় যে, সি.আই.এ সেখানে বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থ সাপ্লাই দিচ্ছে। তাদের ক্যারিয়ার অফিসার ও অ্যানালিস্টরা ছিল ওয়াশিংটন পোস্টের সাবস্ক্রাইবার।

অন্যান্য সংবাদদাতার মতো আমিও দুই দিক থেকেই আফগানিস্তান যুদ্ধের সংবাদ কভার করতাম। মাঝেমধ্যে কাবুলে যেতাম নজিবুল্লাহ ও তার সহযোগিদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট জেনারেলদের সাথে দেশের আনাচে-কানাচেও ঘুরে বেড়িয়েছি। পাকিস্তান থেকে সীমান্তবর্তী গ্রাম এলাকায় গিয়েছি

সেখানে ইসলামিক বিদ্রোহীদের দখলকৃত অঞ্চল স্বচক্ষে দেখার জন্য। মাঝারি মাত্রার গৃহযুদ্ধ চলায় কাজটা নিরাপদেই করছিলাম সেখানে। তবে সেই সময়ে পশ্চিমা সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের সতর্ক থাকতে হতো আফগান মুজাহিদিনদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরব ইসলামিস্ট ভলান্টিয়ারদের ব্যাপারে। এই আন্তর্জাতিক উগ্রবাদীরা মাঝেমধ্যে অমুসলিমদের হত্যা করত। আমরা তখনো জানতাম না এদের নাম আল-কায়েদা।

সি.আই.এ তখন পাকিস্তানের মূল গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আই.এস.আই-এর মাধ্যমে আফগান বিদ্রোহীদের সাহায্য করত।

১৯৮৯ সালের দিকে এই সংস্থা পাকিস্তানে ক্ষমতার চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। তারা ছিল পাকিস্তানের ছায়া সরকার। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর ছিল চরম প্রভাব। তাদের হাত ধরেই উত্থান ঘটেছিল সশস্ত্র ইসলামিস্ট বিভিন্ন দলের। এর মধ্যে আরব ইসলামিস্ট ভলান্টিয়ারদের কথা বলা যায়। তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হতো। আই.এস.আই অফিসারদের সাক্ষাৎ পাওয়া খুব সহজ ছিল না, তবে অসম্ভবও ছিল না। আফগান যুদ্ধের চুলচেরা খবর পরিবেশনের জন্য আমার ছিল প্রবল ঝোঁক। সি.আই.এ দ্বারা বিদ্রোহীদের সশস্ত্র সহায়তা কার্যক্রম কীভাবে কাজ করত, এর উত্থান কীভাবে সোভিয়েত হটিয়ে দিয়েছিল এসব ব্যাপারে ওয়াশিংটন পোস্টে রিপোর্ট করতাম। এছাড়াও আই.এস.আই-এর মাধ্যমে সি.আই.এ'র গুপ্ত কার্যক্রম কীভাবে বিভিন্ন উগ্রবাদী দলের জন্ম দেয় এ ব্যাপারেও লিখতাম।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। মস্কো ও মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ে আফগানিস্তানেও।

নজিবুল্লাহ সরকারের প্রতি সোভিয়েত অর্থ, খাদ্য ও অস্ত্র সহায়তা বন্ধ হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধের ভারসাম্যে আসে পরিবর্তন।

১৯৯২ সালের এপ্রিলের দিকে আই.এস.আই মদদপুষ্ট ইসলামি বিদ্রোহীদের হাতে কাবুলের পতন ছিল অনিবার্য। আমি সেখানে চলে গেলাম। মুজাহিদিনরা কোনো বাধা ছাড়াই শনিবারে রাজধানীতে প্রবেশ করে।

এক দশক থেকে কাবুলের লোকজন অসাম্প্রদায়িক সরকারের অধীনে ছিল। রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ দমনের জন্য তারা দাড়িওয়ালা বিদ্রোহীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। নজিবুল্লাহ পালানোর চেষ্টা করে। তাকে এয়ারপোর্টে আটক করা হয়। তার সিকিউরিটি ফোর্স নিজেদের ইউনিফর্ম খুলে নেয় ও পদত্যাগ করে। তারা নিজেদের ঘরে ফিরে যায় এবং নতুন শাসনব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কাবুলে মুজাহিদিনদের বরণ করে নেওয়া হলেও মুজাহিদিনরা সংশয়ে ছিল। তারা এটি বিশ্বাস করবে কি না বুঝতে পারল না।

তাদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিন চিড়িয়াখানার পাশে এক বিদ্রোহীর সাথে আমার দেখা হয়। সে জানায় তার নাম সাঈদ মুনির। সে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল বহন করছিল।

সে একটি বৃত্ত আঁকল। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার সাথে দশ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলুন। আপনারা সবাই বন্ধুত্বপূর্ণ। তবে হতে পারে এখানে কেউ আমার রাইফেল কেড়ে নিতে চায়।"

তার সাবধানতা ঠিকই ছিল। সেই রাতে আফগানিস্তানের বিভিন্ন বিদ্রোহী দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। কাবুলকে গ্রাস করে নিল সেই যুদ্ধ। ঝরে গেল হাজারো নিরপরাধ জীবন। এর ফলে আফগানিস্তান তলিয়ে গেল আরও গভীর দারিদ্রতায়। হয়ে গেল আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন।

এদিকে আমেরিকা স্নায়ুযুদ্ধে তার বিজয় এবং জার্মানি একত্রিত হওয়ার মতো চমকপ্রদ ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে নিমগ্ন ছিল।

আমি চলে এলাম লন্ডনে। ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিভ করেসপনডেন্ট হিসেবে যোগ দিলাম। সেখানে দায়িত্ব গ্রহণ করি ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে, যখন আফগান যুদ্ধের সাথে জড়িত জিহাদি চক্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নিচে ট্রাকবোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ছয়জন নিহত এবং অনেকেই আহত হয়। আমার এডিটররা আমাকে ইনভেস্টিগেশন করতে বললেন। ইনভেস্টিগেশন করতে হবে ইসলামিক জঙ্গি নেটওয়ার্ক ও তাদের আর্থিক মদদদাতাদের নিয়ে। রিপোর্টার স্টিভ লেভিনের সাথে এ ব্যাপারে তার কিছু প্রজেক্টে আমি কাজ করেছি। আমরা সুদানে নির্বাসিত এক ধনকুবের সৌদি ব্যক্তির ব্যাপারে জানলাম। লোকটার নাম ওসামা বিন লাদেন। লোকটা এসব জঙ্গি দলকে ফান্ড সহায়তা দিচ্ছে বলে জানতে পারলাম। স্টিভ খার্তুমে ছুটে গেল লোকটার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। বিন লাদেনের দেহরক্ষী জানাল বিন লাদেনকে এখন পাওয়া যাবে না। লন্ডন থেকে বলকান, বলকান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে জিহাদি মুভমেন্টের সদস্য এবং বিন লাদেনের সহযোগি ও সমর্থকদের সাথে কথা বলার পর আমরা লিখলাম, "বিন লাদেনের খার্তুমের বহুতলবিশিষ্ট বাসভবনটি কোনো জঙ্গি হেডকোয়ার্টার নয়। তবে এ জায়গা ইসলামিক জঙ্গিদের সাহায্য, সমর্থন ও আশ্রয়স্থল হতে পারে।"

আমরা তখনো আল-কায়েদার নাম শুনিনি। বিন লাদেনের কুখ্যাতি বাড়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদানের ওপর চাপ প্রয়োগ করে খার্তুম থেকে লাদেনকে বের করে দেওয়ার জন্য। লাদেন ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তান আশ্রয় ফেরেন, তাকে আশ্রয় দেয় তালেবান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ওসামা বিন লাদেন।

২০০১ সালে ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ম্যানেজিং এডিটর ছিলাম। সেই বসন্তে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয় নিউইয়র্কে জিহাদি ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের সংবাদ। তারা ১৯৯৮ সালের আগস্টে আফ্রিকায় দুটি মার্কিন দূতাবাসে হামলার সাথে জড়িত

ছিল। এতে প্রসিকিউটররা বিন লাদেনের হামলায় সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেশ করেন। একই সাথে আল-কায়েদার নেতা হিসেবে বিন লাদেনের পরিচয় জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়। এক দলত্যাগী সাক্ষ্য দেয় কীভাবে আল-কায়েদা কাজ করে এবং কীভাবে বিন লাদেন ও তার সহযোগিরা তাদের অনুসারী ও মিত্রদের সমর্থন করত। ওয়াশিংটন জানায় দলটি আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তার ঘাঁটি গেড়েছে। এটি বিভিন্ন দেশে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমেরিকার বাইরে আল-কায়েদা ছিল মারাত্মক উপদ্রবের নাম। তবে আমেরিকা ও এর নিরাপত্তার জন্য তেমন গুরতর হুমকি ছিল না।

১১ সেপ্টেম্বরে ম্যারিল্যান্ডে আমার বাসার অফিসে বসে কাজ করছিলাম। টাইপ করছিলাম আফ্রিকার জেনোসাইড নিয়ে একটি বই। এক পাশে একটি ছোট্ট টিভিতে সিএনএন চ্যানেল চলছিল। প্রথম রিপোর্টে যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে একটি বিমান আঘাত হানার ঘটনা দেখি, তখন এক্সিডেন্ট বলেই ভেবেছিলাম। চাবি এবং দরকারি কাগজপত্র নিয়ে নিউজরুমে ছুটলাম। দরজার কাছে যেতেই আমার স্ত্রী ফোন দিয়ে বলল, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ফ্লাইট-১৭৫ সাউথ টাওয়ারে হামলা করেছে। কয়েক মিনিট সেই ভয়াবহ ঘটনার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'ওহ, এটা বিন লাদেনের কাজ।' আমি বলেই ফেললাম কথাটা।

শহরের দিকে ছুটলাম। পটোম্যাক নদীর দিকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। সেখানে আমেরিকান ফ্লাইট এয়ারলাইন্স-৭৭ পেন্টাগনে হামলা করেছে।

ঘটনার ছয় সপ্তাহ পর আমি আমার গ্যারেজে পুরনো টেপ রেকর্ডিং খুঁজছিলাম। ওগুলো ছিল ৯০-এর দশকে নেওয়া আই.এস.আই অফিসারদের ইন্টারভিউ। অবশেষে পেয়ে গেলাম। এই প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে গবেষণা শুরু হয়। ফলাফল হিসেবে আসে—Ghost Wars: The Secret History of CIA, Afganistan and Bin Laden from the Soviet Invasion to September 10, 2001.

আমার উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে গোপন কার্যক্রম, বিতর্ক ও পলিসি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। যা আল-কায়েদার উত্থান, আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ ও সবশেষে সেপ্টেম্বর ১১ এর মতো ঘটনার মূলে ছিল। আমি কিছু রিসার্চ কাজের জন্য আফগানিস্তান ও পাকিস্তান চলে গেলাম। 'Ghost Wars' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে।

তখন পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল। এরপর কয়েক বছর ধরে তালেবান ও আল-কায়েদার পুনর্জাগরণ ঘটে। ফলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পতিত হয়।

আই.এস.আই আবারও আফগানিস্তানের ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সি.আই.এ বিপদ সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। বুশ ও ওবামা

প্রশাসন তালেবানকে দমন করা ও আল-কায়েদাকে পরাজিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ২০০১ সালের পরে শত হাজারো আমেরিকান তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে আফগানিস্তানে সৈন্য, কুটনীতিবিদ এবং কর্মী হিসেবে কাজ করার। শত শত চুক্তিভিত্তিক কর্মীসহ দুই হাজারের মতো আমেরিকান সেনা নিহত হয়। বিশ হাজারেরও বেশি সেনা শারীরিক-মানসিক ক্ষত নিয়ে ফিরে আসে। অনেকেই ফিরে আসে আসে নিরাপদে। তবে ছুড়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রশ্ন।

এই আমেরিকানদের কেন কষ্ট স্বীকার করতে হলো, কেনই বা ২০০১ সালের শেষদিকে আমেরিকার প্রায় সফল আফগান যুদ্ধ ব্যর্থ হয় তালেবান ও আল-কায়েদাকে চিরতরে ধ্বংস করতে?

দ্য সিক্রেট ওয়ার ইন আফগানিস্তান বইটি প্রমাণ সাপেক্ষে সেইসব প্রশ্নের দিকেই আলোকপাত করবে। এই বইটি "Ghost Wars" এ বর্ণিত জার্নালিস্টিক হিস্ট্রির ২য় খণ্ড।

সি.আই.এ, আই.এস.আই ও আফগান গোয়েন্দা সংস্থা তালেবানের পতনের পরই আফগানিস্তানে নতুন যুদ্ধ উস্কে দেয় এবং সেই যুদ্ধের ফলে পুনরুত্থান ঘটে আল-কায়েদা, মিত্র জঙ্গি নেটওয়ার্ক ও ইসলামিক স্টেটের বিভিন্ন শাখার। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে। এছাড়াও জিহাদি টেরোরিজম দমনে আমেরিকা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং আন্তর্জাতিক পলিসির ব্যর্থতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বইয়ে চেষ্টা করা হয়েছে ওয়াশিংটন, ইসলামাবাদ, কাবুলের পলিসি, বিতর্ক, সিদ্ধান্ত ও সিক্রেট অপারেশন সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনা করার।

Ghost Wars এর মতো এই খণ্ডে চেষ্টা করেছি প্রকৃত রিপোর্ট, বিভিন্ন কাজ এবং চরিত্রকে গুরুত্ব দিতে। ২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো তালেবানের ওপর প্রত্যক্ষ হামলা চালায়। গোপনে ড্রোনের মাধ্যমে আল-কায়েদা ও তার সহযোগি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ড্রোন ক্যাম্পেইন শুরু হয়।

এই ক্যাম্পেইন ছিল Little America (Rajiv Chandrasekaran), Obama's Wars (Bob Woodward) এবং The Way of the Knife (Mark Mazzetti) বইয়ের মতো বেশ কয়েকটা ইন্টারেস্টিং বইয়ের বিষয়। এসব বইয়ে সেই সময়গুলোতে সি.আই.এ'র ভূমিকার ব্যাপারে বেশ গভীর আলোচনা হয়েছে।

Directorate S বইয়ে আমি সেই যুদ্ধের ব্যাপারে বিস্তারিত না হলেও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আলোচনা করতে চেয়েছি। চেষ্টা করেছি সি.আই.এ, আই.এস.আই, আফগান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ও ন্যাশনাল ডিরেক্টরেট অব সিকিউরিটির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আলোচনা করতে।

আমি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে যাই ২০০৫ সালের দিকে এবং রিসার্চ করতে শুরু করি। যেটা এখন Directorate S হিসেবে আপনারা দেখছেন। বিভিন্ন

স্বনামধন্য সাংবাদিক, স্কলারের রিসার্চ ব্যতীত এই খণ্ডে আমি সব সূক্ষ্ম বিষয় একত্রিত করতে পারতাম না। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার সহকর্মী, বন্ধু। Directorate S-এ নিজের রিপোর্টিংয়ের ভিত্তিতেই আমি সব তুলে ধরতে মনোনিবেশ করেছি। বিশেষ করে গত দশকে এই বইয়ের জন্য নেওয়া শত শত ইন্টারভিউ এবং সেসব থেকে পাওয়া ডকুমেন্টারি প্রমাণ তুলে ধরেছি। এসব ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ, F.O.I.A থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্ট ও উইকিলিকসের ফাঁসকৃত স্টেট ডিপার্টমেন্ট ক্যাবলের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

স্বাধীন আফগানিস্তান ছিল দরিদ্র কিন্তু শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত আক্রমণের আগে ছিল না কোনো জঙ্গিবাদী আন্তর্জাতিক সহিংসতা। আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধকে বারবার উস্কে দিয়েছে বিদেশি শক্তি, বিশেষ করে পাকিস্তান। আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের জন্য এবং মানবাধিকার রক্ষায় একদিকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। একই সাথে সেখানকার দুর্নীতি, সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতাতেও অবদান রেখেছে তারা।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বলা যায়, সেনাবাহিনী ও আই.এস.আই-এর দুঃশাসন এবং দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক মিত্ররা না থাকলে পাকিস্তান উন্নতি করতে পারত। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বেশ শক্তিশালী ইতিবাচক ভূমিকাও রাখতে পারত তারা। এই অঞ্চলের বিরতিহীন দ্বন্দ্ব এর সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব দ্বন্দ্ব হলো দুঃশাসন ও সহিংস হস্তক্ষেপের ফল। এর প্রভাব রয়েছে কাবুল, ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক কৌশল, গোয়েন্দা অপারেশন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিক্রেট ডিপ্লোম্যাসিতেও। যা আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের জ্ঞানের বাইরে। এটাই Directorate S (দ্য সিক্রেট ওয়ার ইন আফগানিস্তান)-এর গল্প।

প্রথম অধ্যায়

Blind into Battle

সেপ্টেম্বর ২০০১-ডিসেম্বর ২০০১

এক

‘খালিদের কিছু একটা হয়েছে’

২০০১ সালের গ্রীষ্মের শেষ দিকে, আমরুল্লাহ সালেহ জার্মানির ফ্রাংকফুর্টের উদ্দেশে যাত্রা করে। ফিল নামের এক সি.আই.এ অফিসারের সাথে দেখা করতে হবে তার। আফগানিস্তানের বিখ্যাত গেরিলা কমান্ডার আহমদ শাহ মাসউদের গোয়েন্দা সম্পর্ক তদারক করত সে। আহমদ শাহ মাসউদ দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে তালেবান ও আল-কায়েদাকে প্রতিরোধ করছিলেন। ২৮ বছর বয়সী সালেহের চালচলনে ছিল গুরুগম্ভীরতা। ক্লিন শেভড চেহারা, আর তার ঘন কালো চুল ছিল ছোট করে ছাটা। সে খুব ভালো ইংরেজি জানত।

সালেহ তার সি.আই.এ দোসরদের সাথে হোটেলে দেখা করল। সে এবং ফিল সি.আই.এ’র গুপ্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলে। এই পরিকল্পনাগুলো মাসউদের জন্য সাজানো হয়েছে। তারা কিছু যন্ত্রপাতি আদানপ্রদান করল। এতে এক ধরনের চশমা ছিল, যা দিয়ে মাসউদের বাহিনী রাতের বেলাতেও স্পষ্টভাবে তালেবান ও আল-কায়েদা জঙ্গিদের ওপর নজরদারি করতে পারবে। সি.আই.এ মাসউদকে বেশ কয়েক বছর ধরে সীমিত আকারে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি সহায়তা দিয়ে আসছিল। ক্লিনটন ও সম্প্রতি বুশ প্রশাসনের নীতির অধীনে সি.আই.এ মাসউদকে তালেবানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অস্ত্র সহায়তা দিতে পারবে না। তাই তারা আল-কায়েদার পলাতক আমির ওসামা বিন লাদেনের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টায় মাসউদকে নন-লেথাল[১] যন্ত্রপাতি সহায়তা দিত। ওসামা বিন লাদেন কৌশলে আফগানিস্তানের তালেবান অধ্যুষিত এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। সি.আই.এ’র দেওয়া যন্ত্রপাতির মধ্যে বেশ বড়সড় টেলিস্কোপ ছিল। আল-কায়েদা ক্যাম্পের ওপর নজরদারির জন্য সি.আই.এ মাসউদকে একটি ক্যামেরাযুক্ত বেলুন দিতে চেয়েছিল। তবে আফগানিস্তানের প্রচণ্ড ভারী বাতাস এবং প্রতিবেশী চীনের ভয়ে এই পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়।

ফ্রাংকফুর্ট ছিল সরবরাহ কেন্দ্র। মাসউদের জন্য সি.আই.এ’র সাপ্লাই লাইন ছিল জার্মান নিয়ন্ত্রিত এবং হেডকোয়ার্টারের সাবধানতার কারণে তা বাধা বিপত্তির

১. নন-লেথাল: প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র।

মুখেও ছিল। ২০০১ সালের দিকে ল্যাংলি সি.আই.এ অফিসারদের মাসউদের হেলিকপ্টারে চড়তে নিষেধ করে। এটা ছিল অনিরাপদ। ফিল ও তার কলিগরা সরাসরি দুশানবে'তে যন্ত্রপাতি সাপ্লাই দিত। সেখানে মাসউদের অফিস চালাত সালেহ। তাজিকিস্তানের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ ছিল একেবারে শেষের দিকে। মাঝেমধ্যে রাজধানীতে রাজনৈতিক কিছু সমস্যা হতো। সি.আই.এ অফিসারদের জন্য সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু তারা একটি উপায় বের করল। তারা সালেহকেই জার্মানিতে এসে এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে যেতে বলল। সি.আই.এ জানত তারা যদি জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা বি.এন.ডি-কে না জানিয়ে কিছু করে তাহলে জার্মান সরকার বিষয়টিকে সিরিয়াসলি নিয়ে নেবে। কিন্তু মাসউদকে দেওয়া এসব জিনিসপত্র ছিল নন-লেথাল। কিছু হয়তো বর্ডারে লাইসেন্সিং নীতির কারণে আটকা পড়তে পারে। তবে এগুলো অস্ত্রের মতো অবৈধ ছিল না। মাসউদের লেফটেন্যান্টরা ছিল অভিজ্ঞ স্মাগলার। মাঝেমধ্যে সি.আই.এ'র জিনিসপত্র কীভাবে বহন করবে তা নিয়ে সালেহকে নিজেকেই ভাবতে হতো।

সালেহ বেশ নার্ভাস হয়ে গেল। ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্টে জার্মান পুলিশ ও কাস্টমসের কাছে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চায় না সে। কোথা থেকে এসব কিনেছে জিজ্ঞেস করলে তার কাছে কোনো উত্তর থাকবে না।

কোনো রিসিপ্ট আছে? না। এই নাইট ভিশন চশমা কোন কাজে ব্যবহার করবে?

এ ক্ষেত্রে আফগানিস্তান যুদ্ধের কথা বলা তো চূড়ান্ত বোকামি। পাঁচ হাজার ডলার দামের স্যাটেলাইট ফোন ও সাবস্ক্রিপশন কেনার জন্য ফান্ড কোথায় পেলে?

সালেহ অতিসম্প্রতি ইন্টেলিজেন্স স্পেশালিস্ট হয়েছে। তবে সে বেশ চতুর। ১৯৯৯ সালে মাসউদ তার আটজন সিনিয়র সহায়তাকারী ও কমান্ডারদের মধ্য থেকে সালেহকে বাছাই করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সি.আই.এ'র প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কাউন্টার টেরোরিস্ট সেন্টারের আয়োজিত এই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সেন্টারের বাইরে খুব অল্প লোকই জানত। এর কারিকুলামের মাঝে ছিল উৎস সন্ধান ও মূল্যায়ন করা, নিয়োগ, টেকনিক্যাল কালেকশন, অ্যানালাইসিস ও রিপোর্ট রাইটিং। প্যারামিলিটারি কোর্সের মধ্যে ছিল ময়দানে টার্গেট নির্ণয়, রণকৌশল ও যোগাযোগ। নেভাডা অঞ্চলে ট্রেইনিদের পাহাড়ের ওপর উঠতে হতো টেলিস্কোপ নিয়ে। এভাবে শেখানো হতো আফগানিস্তানের প্রেক্ষিতে নিরীক্ষণ করার বিষয়টি। সি.আই.এ'র কাউন্টার স্পেশালিস্ট সেন্টার আশা করত মাসউদের গেরিলারা কোনো একদিন লাদেনকে ধরতে পারবে। যদিও উত্তরাঞ্চলে মাসউদের বাহিনী যেখানে ছিল সেখানে আল-কায়েদা নেতা খুব কমই গিয়েছিলেন।

সি.আই.এ স্কুলে প্যারামিলিটারি ইনস্ট্রাকশনের ওপর সালেহ কিছুটা বিরক্ত ছিল। তার ভালো লাগত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা। সে চাইত ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম

ও মেথড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। সে কিছু সি.আই.এ অফিসার পেয়ে গেল যারা তাকে এক্সট্রা সময় দিত। সি.আই.এ কীভাবে কাজ করত সেটা খুব ভালো করে বুঝতে চাইত সে। কোর্স শেষ হওয়ার পরে স্পাই সার্ভিস ও ইন্টেলিজেন্স হিস্ট্রির ওপর কিছু বই কিনে সালেহ। সি.আই.এ'র যেসব অফিসারদের সাথে সে কাজ করত তারা বুঝতে পারল সালেহ নির্ভয়, প্রফেশনাল, সৎ এবং দায়িত্বশীল। যদিও আফগান সমাজের প্রেক্ষিতে কমান্ড দেওয়ার জন্য খুব অল্পবয়সী সে। ওখানে বয়স ও অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

জার্মানিতে শিপিং প্রবলেম দূর করার জন্য সে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মেথড ব্যবহার করে। পেইড এজেন্ট ও কর্মী ছাড়াও সারাবিশ্বে মোসাদের সহযোগি নেটওয়ার্ক ছিল। বিভিন্ন সার্ভিসে তাদের বন্ধু ছিল যাদের থেকে তারা সহায়তা নিত। সালেহ ফ্রাংকফুর্টে এক আফগান-জার্মান ব্যবসায়ীকে ফোন দিল।

"একটি কাজে আপনার সহায়তা লাগবে।" সালেহ বলল।

লোকটি তাকে বলল একটি হোটেলে দেখা করতে।

"আমি মিথ্যে বলব না। এটা একটা যন্ত্র। ভাগ্য ভালো হলে ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। নয়তো তারা এটা জব্দ করবে। এটা মারণাস্ত্র না হলেও যুদ্ধে ব্যবহৃত যন্ত্র।" সালেহ বলল।

"দেখ ভাই, তোমাকে সহায়তা করব বলেছি। কিন্তু স্মাগলিং নয়।" ব্যবসায়ী বলল।

"এটা স্মাগলিং নয়। এগুলো সব প্লাস্টিক। কোনো মারণাস্ত্র নয়। কয়েকটা চশমা শুধু।"

সালেহের অনুরোধের পরও লোকটা কোনো সহায়তা করতে রাজি হলো না।

একটি সোফার অর্ধেক আয়তনের যন্ত্রপাতি ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্টে ট্রান্সপোর্ট করল সালেহ। নিজের জন্য উজবেকিস্তানের তাসখন্দের ফ্লাইট বুক করল। সেখান থেকে দুশানবে যাবে। সালেহ এবং মাসউদ তালেবানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সি.আই.এ রিপোর্ট অনুসারে মাসউদের কমান্ডার ও লেফটেন্যান্টদের লন্ডন ও বিভিন্ন দেশে অ্যাকাউন্ট ছিল। লন্ডন অ্যাকাউন্টের মাত্র ৬০ মিলিয়ন ডলারের ওপর মাসউদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তবু তারা তালেবান ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তান একটি পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। এর জিডিপি ২০০১ সালে ছিল ৭০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি।

লুফটহ্যানসা কাউন্টারে সালেহ ফর্ম পূরণ করল। সেখানে তার জিনিসপত্রের জন্য তাকে কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। সি.আই.এ জার্মানদের বখশিশ দিয়েছে কি না এবং জার্মানরা রাজি হয়েছে কি না এসবের কিছুই সালেহ জানে না। একটা লম্বা কথাবার্তার পর সালেহের কার্গোর ওজনের ভিত্তিতে লুফটহ্যানসা কিছু অর্থ দাবি করল শুধু।

কাবুলের পাঞ্জশির উপত্যকার একটি দরিদ্র পরিবারে আমরুল্লাহ সালেহের জন্ম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সে সবার ছোট। সাত বছর বয়সে তাকে এতিম হতে হয়। ১৯৮০ সালের দিকের সোভিয়েত আগ্রাসনের মধ্যে সে বেড়ে উঠতে থাকে। খুব ভালো করেই রাজনৈতিক সহিংসতা দেখেছে সে। তার একভাই কোনো এক অজ্ঞাত দলের হাতে মারা পড়ল। আরেক ভাই ছিল এয়ারফোর্স অফিসার। কান্দাহারে এক গুপ্তঘাতকের শিকার হয় সে। ২২ বছর বয়সে পাঞ্জশির উপত্যকার মাসউদের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয় সালেহ। পাঞ্জশির কাবুলের উত্তরাংশ থেকে তাজিকিস্তানের দিকে বিস্তৃত। উপত্যকায় তাজিক উপজাতিদের বাস। জীবিকা হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে কৃষি, চোরাচালান, ব্যবসা ও পান্না খনি মাইনিং-এর কাজ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহর কমিউনিস্ট শাসনকে সহায়তার জন্য কয়েকজন পরামর্শক রেখে যায়। নজিবুল্লাহ ছিল সাবেক গোপন পুলিশের প্রধান। কাবুলে কমিউনিস্ট সরকার ও মুজাহিদিন গেরিলাদের সংঘর্ষ চলছিল। সংঘর্ষ চলছিল গেরিলাদের অভ্যন্তরেও। মাসউদ সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত বিরোধী দলীয় নেতা ও ইতিহাসের সবচেয়ে সফল গেরিলা যুদ্ধের নেতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী রণকৌশল সম্পন্ন ব্যক্তি একইসাথে তিনি তার নাগরিকদের নিরাপত্তা ও খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন ছিলেন।

সালেহ ছিল মেধাবী। সে ইংরেজি জানত তাই মাসউদের লেফটেন্যান্টরা তাকে ১৯৯২ সালে পাকিস্তান পাঠায় জাতিসংঘের "Post-Conflict Reconstruction and Management" কোর্সের জন্য। সালেহ হিউম্যানিটারিয়ান অপারেশনের ওপর পড়ালেখা করে। শীঘ্রই সালেহ মাসউদের দলের সবচেয়ে তরুণ পরামর্শক হিসেবে জায়গা করে নেয়।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝিতে সে রাশিয়া যায়। রাশিয়ান ভাষা শিখে এবং আফগানিস্তানের এই পুরনো উৎপীড়কের সাথে নতুন পার্টনারশিপ গড়ার জন্য ভাবতে থাকে। প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের সময় রাশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে সালেহ পাঞ্জশির ফিরে আসে। কারণ রাশিয়ান সরকার কোনো সহায়তা দিতে পারবে না। জাতিসংঘের আয়োজিত তালেবানদের সাথে শান্তি আলোচনায় মাসউদ সালেহকে পাঠিয়েছিলেন। সালেহ সি.আই.এ'র সাথে কাজ শুরু করে।

সি.আই.এ'র যে ইউনিট মাসউদের গেরিলাদের সাথে যোগাযোগ করত একে বলা হতো ALEC স্টেশন। এর উদ্দেশ্য ছিল ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার অন্যান্য নেতাদের আটক করা। এর ছিল ২৫ জন অপারেশন অফিসার ও অ্যানালিস্ট। ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে সি.আই.এ হেডকোয়ার্টারে এর মূল অবস্থান ছিল।

আফ্রিকা ডিভিশনের ক্ল্যান্ডেস্টাইন বা গুপ্ত সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ অপারেশন অফিসার রিচার্ড ব্লি ১৯৯৯ সালে ALEC স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৯৮ সালে আফ্রিকাতে আমেরিকান দূতাবাসে আল-কায়েদা বোমা হামলা চালালে ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের অফিসাররা মিশর, জর্ডান, কেনিয়া, পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বে সন্দেহভাজন আল-কায়েদা সদস্যদের বাসায় রেইড দেয়। আরবি, ইংলিশ, উরদুসহ বিভিন্ন ভাষার ডকুমেন্ট ও কম্পিউটার ড্রাইভ জব্দ করে তা নিয়ে আসে ALEC স্টেশনে। বিভিন্ন হামলা এড়ানোর জন্য কিছু ক্লু ও নামের সন্ধানে সেগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

২০০১ সালের মধ্যে স্টেশন অ্যানালিস্টরা আল-কায়েদার ব্যাপারে মাসে ২৩টি রিপোর্ট এফ.বি.আই-কে পাঠাত। সিনিয়র অফিসাররা দেখল সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ না করলে আর শনিবার ও রবিবারে কিছু সময় কাজ না করলে কাজের জট ছাড়াতে পারবে না তারা।

ব্লি বেশ কিছু অস্থিতিশীল জায়গায় কাজ করেছেন। সি.আই.এ'র হয়ে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের রাজধানী বাংগুল, নাইজারের রাজধানী নিয়ামি, নাইজেরিয়ার লাগোস, আলজিয়ার্সে ব্লি কাজ করেছেন। তিনি সেকেন্ড জেনারেশন সি.আই.এ অফিসার। কনফ্লিক্ট জোনে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। আফগানিস্তান একটি ল্যান্ডলকড দেশ। আল-কায়েদার অভয়ারণ্য। এখানে আমেরিকার কোনো দূতাবাস নেই। ব্লি আফগান কমান্ডার আহমদ শাহ মাসউদের মাধ্যমে কাজ করছিলেন। মাসউদ সি.আই.এ'র সাথে তার লাদেন বিদ্বেষ ভাগাভাগি করছিলেন।

"আমাদের দুশমন একই, চল একসাথে কাজ করি।" ব্লি কমান্ডার মাসউদকে বললেন।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে সি.আই.এ'র কাউন্টার টেরোরিজম অফিসারদের একটি দল পাঞ্জশির আসে মাসউদের সাথে দেখা করার জন্য। এর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ব্লি। তারা মাসউদের গোয়েন্দাদের সাথে ALEC স্টেশনের সংযোগ এবং সিকিউরড মেসেজ আদানপ্রদানের জন্য ইন্টারসেপ্ট গিয়ার, এনক্রিপ্টেড কমিউনিকেশন লিংক সহায়তা দেয়। একটি এনক্রিপ্টেড টার্মিনাল ছিল দুশানবেতে, অন্যটি ছিল পাঞ্জশিরে। মাসউদ আমরুল্লাহ সালেহকে ব্লির সাথে যোগাযোগ রক্ষায় নিয়োগ দিলেন।

ওই বছর এডেনে ইয়েমেনি পোর্টে আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ USS Cole-এ আল-কায়েদা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে ক্লিনটনের হোয়াইট হাউজ থেকে ব্লিকে অনুরোধ করা হয় একটি প্ল্যান তৈরি করার। এটি ছিল মাসউদকে লাদেন হান্টের বাইরেও বিভিন্ন মিশনে ও তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করার ১৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রোগ্রাম। যদিও অনেক আমেরিকান, ইউরোপীয় গোয়েন্দা অফিসার, জেনারেল, কূটনীতিবিদ আল-কায়েদার বিরুদ্ধে মাসউদকেই যথেষ্ট ক্ষমতাবান পার্টনার হিসেবে ভাবতে পারছিল না।

ঔপনিবেশিক ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্য দেখে তারা চাচ্ছিল না আমেরিকা আফগানিস্তানের সিভিল ওয়ারের সাথে জড়িয়ে যাক। ১৯৯০ সালের দিকে পাঞ্জশিরিরা একটি গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল। তাদের যুদ্ধে ফান্ড সংগ্রহের জন্য তারা রত্ন, হেরোইন চোরাচালান করত।

মাসউদ তার দলীয় কোন্দলে হেরে যাওয়ায় নিজস্ব স্বার্থে আন্তর্জাতিক সাহায্য চাইছেন—এই ভাবনার কারণে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে তার হুঁশিয়ারি নাকচ হয়ে যেতে পারে।

ব্লি ওয়াশিংটনে মাসউদের সবচেয়ে বড় সমর্থনকারী ছিল। তাকে চে গুয়েভারার মতো কিংবদন্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হলো। আমেরিকার উদ্দেশে মাসউদের বার্তা ছিল, আমি এই অঞ্চলে তোমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ব্লি মাসউদকে সমর্থন করলেও ওয়াশিংটনে আফগানিস্তানের ব্যাপারটা গুরুত্ব পাচ্ছিল না।

তিনি মাসউদকে বললেন, "দেখো, কারও আফগানিস্তান নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তারা চায় লাদেনকে। আমি তোমার সাথে আফগানিস্তানের সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলতে পারব না। আমি শুধু লাদেনের ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে পারব। তবে দেখা যাক পরিস্থিতি কোন দিকে যায়।"

মাসউদ বুঝতে পারলেন। তার সব আন্তর্জাতিক মিত্র ও বিদেশি সাপ্লায়াররা কোনো না কোনোভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল।

ALEC স্টেশন আল-কায়েদার বিরুদ্ধে কয়েকটি অপারেশন চালিয়েছিল। এর মধ্যে উজবেকিস্তানের তাসখন্দ সি.আই.এ স্টেশন থেকে প্রিডেটর ড্রোন সার্ভেইল্যান্স ফ্লাইট অন্যতম। আমরুল্লাহ সালেহ সেখানকার ও ভার্জিনিয়ার উভয় জায়গার সি.আই.এ'র সাথেই কাজ করেছে।

২০০১ সালের দিকে যখন আমেরিকা মাসউদকে সম্পূর্ণ সহায়তা দিতে ইতস্ততবোধ করছিল তখন তাসখন্দে ব্লির এক কলিগ কাউন্টার টেরোরিস্ট সেন্টার কেইস অফিসার জিম লুইসের সাথে সালেহের কথা হয়। লুইস সালেহকে ১৯৯৮ সালের মুভি The Stege দেখতে বলে। মুভিতে দেখা যায় একটি জঙ্গিদল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোমা হামলা চালায়। সরকার তখন মার্শাল ল' জারি করে। লুইস ভবিষ্যৎ বাণী করে, "এরকম কিছু আমাদের দেশে ঘটবে। কিন্তু কেউই আমাদের কথার গুরুত্ব দিচ্ছে না।"

*****

সালেহ ফ্রাংকফুর্ট থেকে দুশানবেতে ফিরে আসে। সেখানে ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মাসউদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। মাসউদ সেখানে ভিজিটিং ইরানিয়ান

কুটনীতিবিদের সাথে আলোচনা করতে এসেছিলেন। যথেষ্ট পরিমাণ আমেরিকান সাপোর্টের অভাবের ফলে মাসউদকে অস্ত্র, অর্থ ও মেডিকেল সহায়তার জন্য নির্ভর করতে হয় ইরান, ইন্ডিয়া ও রাশিয়ার ওপর। ইরান ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র। ইরানিয়ান রিভল্যুশনারী গার্ড ও গোয়েন্দারা মাসউদের গেরিলার সাথে আফগানিস্তানের উত্তরাংশে কাজ করছিল।

সেখানে থাকাকালীন মাসউদকে সালেহ জিজ্ঞেস করে, "আমি এই যন্ত্র কোথায় পাঠাব?" সম্প্রতি পাওয়া যন্ত্রগুলোর কথা বলছিল সে।

মাসউদ বললেন, "তাজিকিস্তানেই থাক। পাঞ্জশিরির কিছু কলিগকে দুশানবে আসতে বলো। তাদের ট্রেনিং দাও এখানে।"

ওই সপ্তাহে মাসউদ আফগানিস্তান ফিরে গেলে বেলজিয়াম পাসপোর্টধারী দুজন সাংবাদিক তার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

*****

২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আরিফ সারওয়ারি বেসমেন্ট অফিসে কাজ করছিল। সে সেখানে আল্ট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি রেডিও, ইন্টারসেপ্ট বক্স, স্যাটেলাইট টেলিফোন তদারক করত। আরিফ ছিল কাবুলের একটি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রনিকসের ছাত্র। মাসউদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সে ড্রপআউট করে। আরিফ ছিল মাসউদের সিনিয়র ইন্টেলিজেন্স অপারেশনস লিডার। সে প্রতিদিনের যুদ্ধে রিপোর্টিং এজেন্ট ও ইন্টারসেপ্ট কালেকশনের দায়িত্বে ছিল। আরিফের সাথে কাজ করা একজন সি.আই.এ অফিসার তাকে ধূর্ত, অপরিচ্ছন্ন ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ, দূর্নীতিগ্রস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য পার্টনার বলে উল্লেখ করে।

তার জন্ম হয় পাঞ্জশিরির একটি পরিবারে ১৯৬১ সালে। সে বেড়ে উঠে কারতে পারওয়ানে। ১৯৮২ সালে সে বিপ্লবে যোগ দিতে পাঞ্জশির যায়। সেখানে ক্লার্ক ও গার্ড হিসেবে কাজ করে। এক বছর পর মাসউদ যখন জানতে পারেন সে রাশিয়ান জানে, পাঞ্জশিরি থেকে এসেছে ও ইলেকট্রনিকস নিয়ে পড়ালেখা করেছে তখন তিনি তাকে পাঞ্জশিরে রাশিয়ান মিলিটারি কমিউনিকেশন তদারকের দায়িত্ব দেন।

ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস M16 সম্প্রতি মাসউদকে একটি জাগুয়ার হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ও কিছু কম্পিউটার দিয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও ইন্টারসেপ্টেড মেসেজের ব্যবহারের জন্য কাউকে দরকার। আরিফ মাসউদের সাথে পাঞ্জশির উপত্যকার অঘোষিত ইন্টেলিজেন্স চিফ হয়ে যায়।

রেডিও ইন্টারসেপ্ট পরিচালনা ছাড়াও সে হিউম্যান রিসোর্স গড়ে তোলে। যুদ্ধের শেষদিকে মাসউদ গোপনে কাবুলে আফগান কমিউনিস্ট দল Karmalites

এর সাথে আঁতাত গড়ে তোলেন। ১৯৯২ সালে কমিউনিস্ট শাসন ভেঙে পড়লে মাসউদ কাবুল দখল করেন। পরবর্তী চার বছর মাসউদ ছিলেন আফগানিস্তানের মিনিস্টার অব ডিফেন্স। ইঞ্জিনিয়ার আরিফ ছিল আফগান ইন্টেলিজেন্স এন্ড সিকিউরিটি সার্ভিস (পূর্ব নাম খাদামাত-ই-আতালা-আত-ই-দৌলতি বা গভমেন্ট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস) এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু এটি সারাদেশে KHAD নামে কুখ্যাত। এর অফিসাররা কমিউনিস্ট আমলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও জঘন্য ইন্টারোগেশনের জন্য কুখ্যাত ছিল। ১৯৯৬ সালে তালেবান কাবুলে নিয়ন্ত্রণ নিলে মাসউদ পাঞ্জশিরে ফিরে যান। কিছু KHAD অফিসারের সাথে মাসউদের যোগাযোগ ছিল যারা তালেবানের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করত। আরিফ কাবুলে ও কান্দাহারে এজেন্টদের কাছে কিছু ছোট স্যাটেলাইট ফোন পাঠায়। তাদের মাসউদের সাথে পাঞ্জশিরে এসে দেখা করতে সহায়তা করে। মাসউদ তাদের জিজ্ঞেস করতেন, পাকিস্তানি সেনারা সেখানে আছে কি না? আল-কায়েদার কী খবর? তাদের অস্ত্রশস্ত্র কীরকম?

কাবুল আক্রমণ খুব সহজ ছিল এর নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণ ও পাঞ্জশির থেকে এর নৈকট্যের জন্য। মাসউদের একজন রিপোর্টিং এজেন্ট কাবুলে তালেবানের সব ইন্টেলিজেন্সের প্রধান ছিল।

মাসউদের হাজারখানেক বই ছিল। তিনি পার্সিয়ান কবিতা পছন্দ করতেন। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে তিনি তার পুরনো রাজনৈতিক বন্ধু মাসুদ খালিলির সাথে দেখা করেন ও কবিতা পাঠ করেন। এটা তারা প্রায়ই করতেন।

পরদিন সকালে কমান্ডার মাসউদ ইঞ্জিনিয়ার আরিফকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন আমেরিকার সাথে কীভাবে সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়? কোন স্ট্রাটেজি নেওয়া যায়?

আরিফের কমিউনিকেশন অ্যান্ড রেডিও ইন্টারসেপ্ট সেন্টার ছিল একটি কংক্রিটের বাড়ির নিচে। খাজা বাহাউদ্দিনে[২] এটাই ছিল তার অফিস। উপরে রিসেপশন রুম ছিল। মাসউদ আরব সাংবাদিকদের কাছে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সাংবাদিকরা আরিফের ইন্টেলিজেন্স রুমের ওপর ক্যামেরা সেট করে।

প্রায় বিকেল হয়ে আসছিল। একপর্যায়ে কমান্ডারের স্যাটেলাইট ফোনে একটি কল আসে। বাগরাম এয়ারফিল্ডে তাদের ফ্রন্টলাইনে তালেবান ও আল-কায়েদা হামলা করেছে। এতে আটজন আরবকে জিম্মি করা হয়েছে।

কমান্ডার আরিফকে বললেন, "দেখো, তুমি সংঘর্ষের তথ্য সংগ্রহ করতে পারো কি না।"

আরিফ নিচে চলে গেল। স্যাটেলাইট ফোনে ব্যস্ত থাকাবস্থায় হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে ফোন তার হাত থেকে ফোন ছিটকে গেল। প্রথমে সে ভাবল

---

২. খাজা বাহাউদ্দিন আফগানিস্তানের তখর প্রদেশের একটি জেলা।

তালেবানের ফাইটার প্লেন থেকে বোমা ফেলা হয়েছে বা শত্রুর রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। খাজা বাহাউদ্দিনে এটা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসতেই আর গার্ডদের চিৎকার শুনে সে দ্রুত উপরে গেল। দেখল রিসেপশন রুমে মাসউদের দেহ পড়ে আছে। খালিলি, যে কি না ইন্টারভিউয়ে ট্রান্সলেটরের কাজ করছিল সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। চারদিকে ছিল রক্ত।

আরিফ কমান্ডারের টয়োটা ল্যান্ড ক্রুইসার আনতে বলল। সে এবং অন্যরা মাসউদকে ল্যান্ড ক্রুইসারের পেছনের সিটে এবং খালিলিকে তিন নম্বর সারির সিটে করে নিয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে আরিফ তখন হেলিকপ্টার আনতে বলল।

ড্রাইভারকে বলল পাঁচ-ছয় মিনিট দূরত্বে কোনো ল্যান্ডিং এরিয়া খুঁজতে।

তারা আকাশে একটি হেলিকপ্টার উড়তে দেখল।

আরিফ বলল, "এটা ইমার্জেন্সি। আমাদের এই হেলিকপ্টার লাগবে। কিন্তু তাদের বলো ইঞ্জিন বন্ধ করার জন্য। আমরা আসছি।"

আরিফ হেলিকপ্টার পাইলটকে ঘটনা বুঝতে দিল না। সে পাইলটকে বলল খাজা বাহাউদ্দিনের অদূরে ইন্ডিয়ান একটি হাসপাতালে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে। আরিফ অফিসে ফিরে এসে মাসউদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি কমান্ডার জেনারেল ফাহিম খানের সাথে স্যাটেলাইট ফোনে যোগাযোগ করল। তারা মাসউদের জন্য ব্যবহৃত কোডওয়ার্ডে কথা বলল, "খালিদের কিছু একটা হয়েছে।"

*****

সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ তাজিকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। সরকারি ও ব্যবসায়িক ছুটি। সালেহ তার বাসায়ই ছিল। তার ফোন বেজে উঠল। মাসউদের ভাতিজা ফোনে বলল, "প্যাকিং করে সময় নষ্ট করো না। এখনই এয়ারপোর্টে যাও। তোমাকে কুলইয়াব চলে যেতে হবে।"

কুলিয়াব ছিল তাজিকিস্তানের একটি শহর। দুশানবে থেকে ১২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। সালেহ জলদি বের হয়ে গেল। ক্রিপটিক তথ্য অনুসরণ করে সে হাসপাতালে পৌঁছায়। সেখানে মাসউদের চার-পাঁচজন কমান্ডার ছিল। কিছুক্ষণ পর এল জেনারেল ফাহিম খান। আরিফ এল সূর্যাস্তের সময়। তার পোশাকে ছিল রক্তের দাগ। তাজিকিস্তান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন অফিসার ও ইরানিয়ান রিভল্যুশনারি গার্ডের একজন সদস্যও এল। একজন মেডিকেল ডাক্তার ও মাসউদের দীর্ঘকালীন ফরেন পলিসি অ্যাডভাইজার আবদুল্লাহ আবদুল্লাহকেও নয়াদিল্লীর একটি কূটনৈতিক ট্রিপ থেকে ডেকে আনা হলো।

কমান্ডাররা আমরুল্লাহ সালেহকে বলল, মাসউদ মারা গেছে। ইন্ডিয়ান হাসপাতাল থেকে মাসউদের লাশ আফগান বর্ডারে আনা হয়। সবাই যেন একটা

ধাক্কা খেল। অনেকেই কান্নাকাটি করল। এর আগেও তালেবান ও আল-কায়েদা মাসউদকে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়। আল-কায়েদার দুই আরব আত্মঘাতী তাদের ক্যামেরায় বোমা ফিট করে নিয়ে এসেছিল। পাঞ্জশিরি নেতারা মাসউদের মৃত্যুর ব্যাপারে জনসম্মুখে মিথ্যা বলার সিদ্ধান্ত নিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল তারা বলবে মাসউদ অল্প আহত হয়েছেন এবং সেরে উঠবেন। আর নয়তো পাঞ্জশিরে ফ্রন্টলাইনে তালেবান ও আল-কায়েদার মুখোমুখি হওয়া তাদের যোদ্ধারা আতংকগ্রস্ত হয়ে যাবে। এতে তালেবানরা উপত্যকায় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাবে। ইরানিয়ান রিভল্যুশনারি গার্ড অফিসার বলল মাসউদের লাশ কুলইয়াবে থাকলে তার মৃত্যুর খবর গোপন রাখা কঠিন হবে। এর চেয়ে ভালো হবে তারা এবং তাজিকিস্তান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস মাসউদের লাশ ইরানের মাশহাদে নিয়ে গিয়ে এক মাস, ছয় মাস যতদিন দরকার তার মৃত্যুর খবর গোপন রাখবে। অনেকেই মাসউদের লাশ পাঞ্জশির নিয়ে যেতে বলল। তবে এতে বিপদের আশংকা ছিল। তাজিকিস্তান অফিসার বলল নিকটস্থ মর্গে তার লাশ কিছুদিনের জন্য রাখা যায়। এর মধ্যে ফাহিম কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করুক। তারা সবাই এই প্ল্যানটিকেই গ্রহণ করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান, ইন্ডিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানকে এ ঘটনা জানাবে।

তারা আমরুল্লাহ সালেহকে বলল, সি.আই.এ-কে ফোন দাও। তাদের মাসউদের হত্যা সম্পর্কে বলো এবং অস্ত্র সহায়তা চাও। ALEC স্টেশনে সালেহকে বলতে হলো, "যদি তালেবান ও আল-কায়েদাকে প্রতিরোধ তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমরা লড়ব। কিন্তু শুধু কমান্ডার মাসউদকে সাহায্য করতে চাইলে সে আর আমাদের সাথে নেই। তার অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ করার জন্য তার জীবিত থাকাকালীন সময়ের চেয়েও বেশি সাহায্য দরকার এখন।"

সালেহ দুশানবেতে ফিরে গেল এবং সি.আই.এ'র কাউন্টার স্পেশালিস্ট সেন্টারে ব্লির উদ্দেশে বার্তা পাঠাল। ব্লি এনক্রিপ্টেড লাইনে কল করলে সালেহ উপরোক্ত কথাগুলো তাকে বলে। সে জানায় মাসউদ মারা গেছে এবং পাঞ্জশিরে তাদের নেতারা এটা গোপন রাখতে চাচ্ছে। ব্লি হোয়াইট হাউজে এই খবর জানালেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বুশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নেতারা জেনে গেছে মাসউদকে হত্যা করা হয়েছে।

সালেহ আবার ফোন দিয়ে বলল, "তোমাকে কথাটা গোপন রাখতে হবে। এভাবে সবাইকে বলে আমার জন্য সমস্যা বাড়াবে না।"

ব্লি জানালেন পলিসি মেকারদের এত গুরুত্বপূর্ণ খবর জানানো সি.আই.এ'র জন্য বাধ্যতামূলক। তবে হোয়াইট হাউজ বা স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিষয়টাকে রিপোর্টারদের প্রশ্নের মুখে কীভাবে হ্যান্ডেল করবে সেটা তারাই জানে। সালেহ জানত ব্লি ও ALEC স্টেশন মাসউদকে অস্ত্র সাপ্লাইয়ের জন্য কাজ করেছে। এর